ইউনিট ৫

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু

পাঠ-১ : অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- বাংলাদেশের অবস্থান জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- জীবন ধারণে নদ-নদীর ভূমিকা জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের অবস্থান

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর স্থলভাগ ভারত ও মায়ানমার দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত সমুদ্র সীমানা। বাংলাদেশের পশ্চিমে, উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণ- পূর্বে রয়েছে যথাক্রমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার সীমান্ত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর সর্বোচ্চ বিস্তৃতি প্রায় ৪৪০ কি.মি. এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কি.মি.। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৪৭১২ কি.মি.। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩৭১৫ কি.মি. এবং মায়ানমারের সাথে ২৮১ কি.মি.। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি.মি.। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কি.মি.) এবং উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০কি.মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত এর অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডগত বিস্তৃতি বা আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

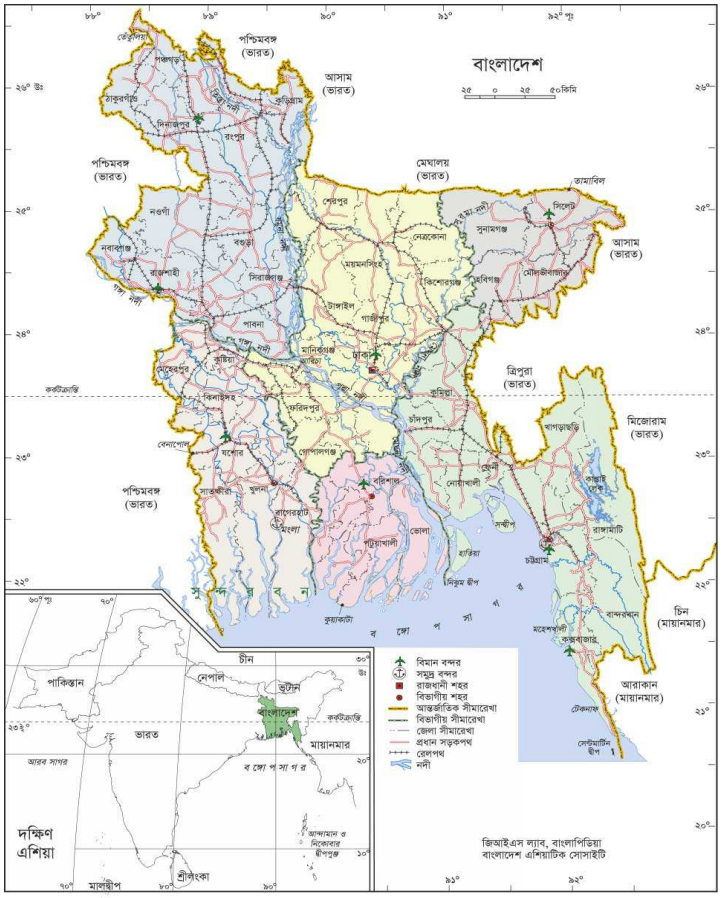

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′পূর্ব থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। বাংলাদেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এশিয়ান হাইওয়ে, ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে এবং ভারতের বিচ্ছিন্ন সেভেন সিস্টার এর সাথে মূল ভারতীয় ভূ-খন্ডের

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকা প্লাইষ্টোসিন নদীজ ও হলোসিন পলিজ অবক্ষেপ দ্বারা গঠিত। তবে বাংলাদেশের অল্পকিছু অঞ্চল কোয়ার্টারনারী যুগে বর্তমান আকৃতি লাভ করে এবং নদী প্রভাবিত ভূ-প্রকৃতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের দক্ষিণের এবং উত্তর পূর্বের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারী যুগের (২০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি বছর পূর্বে) ভূমিরূপ। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির প্রায় অর্ধেক অংশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীপ্রণালীর ভাটিতে অবস্থিত। এবং এর গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০ মিটারের বেশি নয় (বাংলাপিডিয়া, ২০০৪)।

উচ্চতা ও ভূমিরূপের দিক হতে আধুনিককালে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হল:

(ক) প্লাবন সমভূমি

(খ) প্লাইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চল এবং

(গ) টারশিয়ারী যুগের পার্বত্য অঞ্চল।

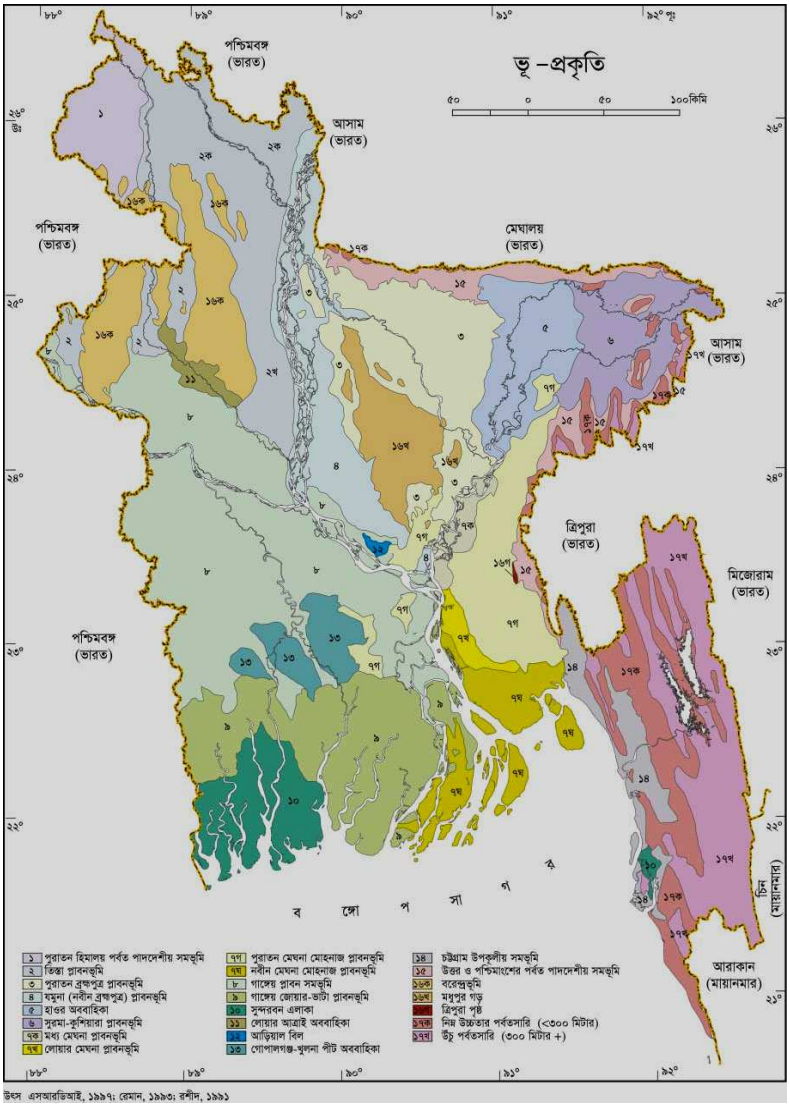

উৎস: এসআরডিআই, ১৯৯৭; রেমান, ১৯৯৩; রশীদ, ১৯৯১

(ক) প্লাবন সমভূমি: নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অপেক্ষাকৃত মসৃণভূমি যা নদীর উপচে পড়া জলরাশি বা প-াবনের ফলে সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিস্ড়ৃত বিভিন্ন নদ-নদী সৃষ্ট প্লাবনভূমি এলাকা। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবনভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন ১ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ সমভূমি উত্তর দিক থেকে উপকূলের দিকে ক্রমশ ঢালু। বাংলাদেশের কৃষি এবং সংস্কৃতিতেও এই ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিরাট প্রভাব রয়েছে। অধিকাংশ চাষযোগ্য উর্বর ভূমি এই ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলভূক্ত এবং দেশটির সংস্কৃতি প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। বাংলাদেশের প্লাবনভূমি অঞ্চলসমূহকে পনেরটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: (১) পুরাতন হিমালয় পর্বত পাদশৌয় সমভূমি (২) তিস্তা প্লাবনভূমি (৩) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র

প্লাবনভূমি (৪) যমুনা (নবীন ব্রহ্মপুত্র) প্লাবনভূমি (৫) হাওর অববাহিকা (৬) সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবনভূমি (৭) মেঘনা প্লাবনভূমি (ক) মধ্য মেঘনা প্লাবনভূমি (খ) নিম্নতর মেঘনা প্লাবনভূমি (গ) পুরাতন মেঘনা মোহনাজ প্লাবনভূমি (ঘ) নবীন মেঘনা মোহনাজ প্লাবনভূমি (৮) গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি (৯) গাঙ্গেয় জোয়ারভাটা প্লাবনভূমি (১০) নিম্নতর আত্রাই অববাহিকা (১১) আড়িয়াল বিল (১২) গোপালগঞ্জ-খুলনা পীট অববাহিকা (১৩) উত্তর ও পশ্চিমাংশের পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি (১৪) চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি এবং (১৫) সুন্দরবন এলাকা।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ এবং উপ-বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

	প্রধান বিভাগ	উপবিভাগ
ক.	প্লাবনভূমি	১. পুরাতন হিমালয় পর্বত পাদশৈয় সমভূমি ২. তিস্ড়া প্লাবনভূমি ৩. পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমি ৪. যমুনা (নবীন ব্রহ্মপুত্র) প্লাবনভূমি ৫. হাওর অববাহিকা ৬. সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকা ৭. মেঘনা প্লাবনভূমি ৮. গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ৯. গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি ১০. নিম্নতর আত্রাই অববাহিকা ১১. আড়িয়াল বিল ১২. গোপালগঞ্জ-খুলনা পীট অববাহিকা ১৩. উত্তর পশ্চিমাংশের পর্বত পাদদেশীয় সমভূমি ১৪. চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি ১৫. সুন্দরবন এলাকা
খ.	প-ইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চল	১. বরেন্দ্র ভূমি ২. লালমাই পাহাড় ৩. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়
গ.	টারশিয়ারী যুগের পার্বত্য অঞ্চল	১. উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ বা স্বল্প উচ্চতার পাহাড়সমূহ ২. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ বা অধিক উচ্চতার পাহাড়সমূহ

(খ) **প-ইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চল :** পূর্বে কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এবং সংলগ্ন টিলাসমূহ থেকে শুরু করে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ড় প্রসারিত। মেঘনা এবং যমুনা নদীপ্রণালী প্লাইস্টোসিন চত্বরসমূহকে ত্রিধারায় বিভক্ত করায় তিনটি উত্থিত অংশর সৃষ্টি হয়েছে, যারা মসৃণ আন্দোলিত ভূ-প্রকৃতি প্রদর্শন করছে। উত্থিত অংশ তিনটি হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যথাক্রমে বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর গড় এবং তিপারা পৃষ্ঠ। পশ্চিমাংশে গঙ্গা এবং যমুনার দুই শাখানদী বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী প্লাইস্টোসিন কালের চত্বরসমূহের দক্ষিণ সীমা রচনা করেছে। রাজশাহী বিভাগের উত্তর প্রান্তে প্লাইস্টোসিন চত্বরের বরেন্দ্র অংশ হিমালয়ের পাদশৈয় সমভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে এবং ময়মনসিংহ জেলার ক্রমশ পলিগঠিত সমভূমির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। বাংলাদেশের মোট প্রায় ১৩,৪৫৭ বর্গকিলোমিটার ভূ-ভাগ জুড়ে প্লাইসটোসিন চত্বরসমূহ বিস্তৃত, যাদের উত্থান গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ মিটারেরও অধিক (বাংলাপিডিয়া, ২০০৪)।

(গ) টারশিয়ারী যুগের পার্বত্য অঞ্চল: বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকাসমূহ দুটি প্রধান ধরনের ভূ-প্রকৃতি নিয়ে গঠিত। যথা- (১) স্বল্প উচ্চতার পাহাড়সমূহ (ডুপি টিলা ও ডিহিং স্তরসমষ্টি) এবং (২) অধিক উচ্চতার পাহাড়সমূহ (সুরমা এবং টিপাম স্তরসমষ্টি) :

(১) স্বল্প উচ্চতার পাহাড়সমূহ বা উত্তর ও পূর্বাংশের পাহাড়সমূহ: উঁচু পাহাড়সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে এবং বহির্ভাগ জুড়ে অবস্থিত। এই পাহাড়সমূহ প্রধানত অসংহত বেলেপাথর এবং কর্দমশিলায় গঠিত। এসকল পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা সাধারণত সমুদ্রতল থেকে ৩০০ মিটারের কম। বেশিরভাগ এলাকাই সংক্ষিপ্ত খাড়া ঢাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু এলাকা

খাড়া থেকে ৩০০ মিটারের কম। বেশিরভাগ এলাকাই সংক্ষিপ্ত খাড়া ঢাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু এলাকা খাড়া থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে সমতল ভূ-প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়েছে (সিলেট অঞ্চলের উৎকৃষ্ট চা-উৎপাদনকারী এলাকাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত)। চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বল্প উচ্চতার পাহাড়সমূহের মধ্যে রয়েছে সীতাকুন্ড ও মারা তং পাহাড়সারি এবং দক্ষিণ ও মধ্য রামগড়সহ ফেনী নদী উপত্যকার পূর্বাংশে অবস্থিত যৌগিক পাহাড়সারি। সীতাকুন্ড পাহাড়সারি মধ্যভাগে ৩২ কি.মি দীর্ঘ এবং সীতাকুন্ড চূড়ার উচ্চতা ৩৫২ মিটার।

(২) অধিক উচ্চতার পাহাড়সমূহ: উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত পর্বতমালা। এই গিরিশ্রেণির চূড়াসমূহের উচ্চতা ৩০০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত। পর্বতসমূহ অত্যধিক খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং সাধারণত ৪০% এর উপর কিংবা প্রায়ই ১০০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। অত্যধিক ঢালের কারণে এখানে প্রায় ভূমিধ্বস সংঘটিত হয়। এ সকল পর্বতের অভ্যন্তরভাগে সুদৃঢ় কর্দমশিলা, পলিপাথর এবং বেলেপাথরের উপস্থিতি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ, হবিগঞ্জের দক্ষিণভাগের কিছু অংশ এবং মৌলভীবাজার জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত জুড়ে এই পর্বতমালা বিস্তৃত। উপ-এককটির মোট আয়তন প্রায় ১০,৩২৪ বর্গ কি.মি।

পাঠ সংক্ষেপ

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। এ দেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা বিস্তৃত। ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে এদেশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল- ক. প্লাবনভূমি খ. প্লাইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চল এবং গ. টারশিয়ারী যুগের পার্বত্য অঞ্চল । প্লাবন সমভূমি প্রায় সারা দেশে বিস্তৃত। এর আয়তন ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। প্লাইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে বরেন্দ্রভূমি, লালমাই পাহাড় এবং মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়। আর পার্বত্য অঞ্চল দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন:৫.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লিখুন।
২. প- াইস্টোসিন কালের চত্বরসমূহ সর্ম্পকে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের অধিক উচ্চতার পাহাড়সমূহ কোথায় অবস্থিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিন।
২. প্লাবন সমভূমির গঠন এবং শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : ভূমি ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমি ও ভূমি ব্যবহার কি তা জানবেন;
- ভূমির বিন্যাস ও ধরন জানবেন;
- ভূমি ব্যবহারের নির্ধারক সম্পর্কে জানবেন;
- ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবেন।

মানুষের অতি প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভূমিকে কেন্দ্র করেই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকূল বেঁচে থাকে। এই ভূমিকে কেন্দ্র করেই জীবন পরিচালিত হয়। কিন্তু ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভূমির পরিমাণ বাড়ছে না। বরং ভূমির নানামুখী ব্যবহারের ফলে এর পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই ভূমির টেকসই ব্যবহার এবং সঠিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ভূমি

সাধারণভাবে বলা যায়, ভূমি বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়। বিশদভাবে বলতে গেলে ভূমি হচ্ছে- মাটি, পাথর, পাহাড়, নদীনালা, সাগর, খনি, মরু, জলবায়ু ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। Oxford Dictionary অনুযায়ী, ' land is the solid portion of the earth surface, as opposed to the sea, water'. ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২ ধারার ১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, যে ভূমি আবাদী, অনাবাদী অথবা বছরের যে কোনো সময় জলে নিমজ্জিত থাকে এবং (ভূমি হতে উৎপন্ন সুবিধাসহ) বাড়ীঘর, দালান-কোঠা, ভূমির সাথে সংযুক্ত বস্তুসমূহ অথবা ভূমির সাথে সংযুক্ত কোন বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে রয়েছে এমন বস্তু বা বস্তুসমূহ ভূমির অন্তর্ভুক্ত বা ভূমি বলে বিবেচিত।

ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার শব্দদ্বয় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ এলাকার জমিগুলো প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়। সাধারণভাবে ভূমি ব্যবহার বলতে মানুষের ভূমি ব্যবহারকে বুঝায়। এটি বন্যভূমি অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশ যা দিয়ে পরিবেশ গঠিত যেমন উন্মুক্ত ভূমি, কৃষি ভূমি, শিল্পভূমি এবং বাসস্থানের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং বলা যায় যে, ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ড় কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হয় তার সবকিছুকেই ভূমি ব্যবহার বলে।

বাংলাদেশের ভূমির বিন্যাস

১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের আমাদের এই বাংলাদেশ। ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০২১ জন এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর। বাংলাদেশের মোট ভূমি এবং এর বিন্যাস নিম্নে দেখানো হলো (সারণি-১)।

সারণি-১: বাংলাদেশের মোট ভূমি এবং বিন্যাস

জমির ধরন	ভূমির পরিমাণ (ব.কি.মি)	শতকরা হার(%)
ব্যবহারযোগ্য ভূমি	১১৯৬২৪	৮১.০৬
জলাভূমি	৮২৩৬	৫.৫৮
বনভূমি	১৯৭১০	১৩.৩৬
মোট	১৪৭৫৭০	১০০.০০

উৎস: মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, জুন-২০১৩, বিবিএস।

বাংলাদেশের ভূমির ধরন: বাংলাদেশের মোট ভূমির ৩০.৬৫ শতাংশ মধ্য উঁচু ভূমি। খুব নীচু ভূমির পরিমাণ মাত্র ৬.৭০ শতাংশ। সার্বিকভাবে কিছু অঞ্চল ব্যতীত সারা দেশই এক উর্বর ভূমি নিয়ে গঠিত। ফলে স্বল্প আয়তনের দেশ হলেও ভূমির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হলো (সারণি-২)।

সারণি-২: বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের ভূমির পরিমাণ

ধরন	পরিমাণ হেক্টর(০০০)	শতকরা হার (%)
উঁচু ভূমি	৪২০০	২৫.৫৫
মধ্য উঁচু ভূমি	৫০৪০	৩০.৬৫
মধ্য নীচু ভূমি	১৯৯১	১২.১০
নীচু ভূমি	১১০২	৬.৭০
খুব নীচু ভূমি	১৯৩৩	১১.৭৬
অন্যান্য	২১৭৮	১৩.২৪
মোট	**১৬৪৪৪**	**১০০.০০**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই-২০১২, বিবিএস।

বাংলাদেশের ভূমির ব্যবহারের ধরন: বাংলাদেশে ভূমির ব্যবহার অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

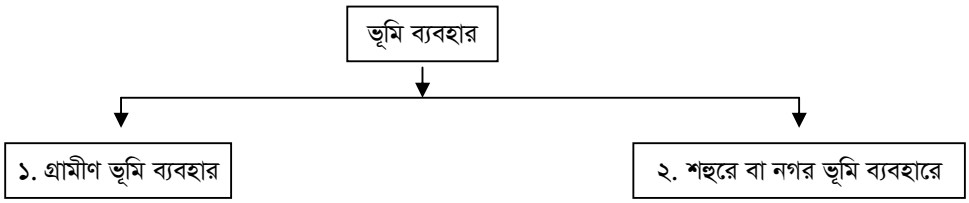

১. গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার: গ্রাম প্রধান এদেশের মোট ভূমির সিংহভাগই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারে বৈচিত্র্যতা কম থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু এলাকায় এর ব্যতিক্রম রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

ক. কৃষি
খ. আবাসিক
গ. কৃষি খামার
ঘ. বনভূমি
ঙ. জলাভূমি
চ. শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
জ. বিবিধ ব্যবহার।

ক. কৃষি: বাংলাদেশের মোট ভূমির শতকরা ৮০ ভাগ কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। বিভিন্ন কৃষিজাত শস্য যেমন- ধান, গম, পাট, আলু, সরিষা এবং ইক্ষুসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষাবাদ করা হয়।

খ. আবাসিক: গ্রামীণ ভূমির একটি বড় অংশ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা হয়। গ্রামীণ বাড়িগুলো খোলামেলা পরিবেশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। বাড়ির মধ্যখানে উঠান, সামনের অংশে বহিরাঙ্গন, গাছ-গাছালি ইত্যাদি থাকে। এছাড়া যৌথ পরিবার ব্যবস্থা হ্রাস পাওয়ায় একক পরিবারের জন্য অধিক গৃহ নির্মিত হচ্ছে।

গ. কৃষি খামার: গ্রামীণ এলাকায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের কৃষি খামার করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, গরু-ছাগল বা মহিষের খামার ইত্যাদি।

ঘ. বনভূমি: দেশের বনাঞ্চলের অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। আর অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য জেলাগুলো এবং উপকূলীয় এলাকায় বিস্তৃত বনভূমি রয়েছে।

ঙ. জলাভূমি: দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে হাওড়, বাওড়, নদীসহ বিভিন্ন জলাভূমি রয়েছে। এছাড়া গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রায় প্রতিটি পরিবারে পুকুর বা ডোবা রয়েছে।

চ. খোলা মাঠঃ গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো খোলা মাঠ। এ ধরনের খোলা মাঠে সাধারণত মেলা, খেলাধূলা, গরু-ছাগলচারণসহ বিভিন্ন কাজ করা হয়ে থাকে।

ছ. শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রামীণভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করা হয়। কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোসহ খোলা মাঠ থাকে।

জ. বিবিধ ব্যবহারঃ এছাড়াও গ্রামীণ ভূমি রাস্তা-ঘাটসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. নগর বা শহুরে ভূমি ব্যবহারঃ নগর ভূমি ব্যবহার বৈচিত্র্যপূর্ণ, নগরায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরীর কর্মকান্ডে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নগরে বিভিন্ন প্রকার কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়ার ফলে ভূমি কতকগুলো ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিস্তৃত হয়। নগরের এক-একটি ইউনিটে বিভিন্ন কার্যকান্ডকে একত্রিত করে একক হিসেবে নগরের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠণ করে। নগরের ভূমি ব্যবহারের প্রধান প্রধান ধরনগুলো নিম্নরূপ–

ক. আবাসিক এলাকা
খ. শিল্প এলাকা
গ. বাণিজ্যিক এলাকা
ঘ. পরিবহন এলাকা
ঙ. শিক্ষা এলাকা
চ. বিনোদন এলাকা
ছ. সেনানিবাস এলাকা
জ. সরকারি ও আধা-সরকারি এলাকা।

ক. আবাসিক এলাকাঃ নগর এলাকায় জনসংখ্যার চাপ অধিক থাকায় ভূমির একটি বড় অংশ আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হয়। রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত। অপরদিকে, নিম্নশ্রেণির মানুষ কারওয়ান বাজার, মগবাজার এলাকায় রেললাইনের ধারে বা সরকারি কোনো খাস জমিতে ঘিঞ্জি পরিবেশে বস্ড়ি এলাকায় মানবেতর জীবন যাপন করে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বড় নগরে এরূপ বস্ড়ি দেখা যায়।

খ. শিল্প এলাকাঃ নগর ভূমি ব্যবহারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক শিল্প এলাকা। সাধারণত ভারী শিল্পগুলো নগর কেন্দ্রের প্রান্ড়ভাগে এবং হালকা ও মাঝারি শিল্প নগর কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে। যেমন– রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও ভারী শিল্প, হাজারীবাগে ট্যানারী শিল্প এবং মিরপুরে বেনারসী পল্লী অবস্থিত। এছাড়া বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর শিল্প এলাকা হিসেবে পরিচিত।

গ. বাণিজ্যিক এলাকাঃ নগরের অন্যতম প্রধান উপাদান বাণিজ্যিক কর্মকান্ড। নগরীয় বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের মধ্যে ব্যাংক বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী চাকুরি, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সেবা, পণ্যের খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় অন্যতম। নগরের বাণিজ্যিক এলাকাসমূহ যোগাযোগের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে।

ঘ. পরিবহন এলাকাঃ একটি নগর এলাকার জন্য পরিবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সড়ক, রেল, বিমান এবং নদীপথ পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। পরিবহনের কাজে নগর ভূমির একটি বড় অংশ ব্যবহৃত হয়। তবে আমাদের দেশে পরিবহন খাতে সে তুলনায় কম ভূমি ব্যবহৃত হয়।

ঙ. বিনোদন এলাকাঃ নগরবাসীর জন্য বিনোদন অপরিহার্য। নগর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম পার্ক, লেক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, সিনেমা হল, থিয়েটার, আর্ট গ্যালারী প্রভৃতি। নগর ভূমির একটি অংশ এ ধরনের বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।

চ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নগর জনগোষ্ঠীর অত্যাবশ্যক। কারণ দেশের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নগরে অবস্থিত। নগরের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে অথবা পুঞ্জীভূতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

ছ. সেনানিবাস এলাকাঃ সাধারণত বিভিন্ন বড় বড় নগর এলাকায় সেনানিবাস এলাকা থাকে। ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে সেনানিবাস রয়েছে।

জ. সরকারি ও আধা সরকারি ভূমিঃ নগর এলাকার বিভিন্ন অংশে সরকারি ও আধা সরকারি ভূমি থাকে। এগুলো সাধারণত রাষ্ট্রীয় অথবা বিশেষ কোনো প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ভূমি ব্যবহার ধরনের পরিবর্তনশীলতা: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে ভূমি ব্যবহারের ধরন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ভূমি ব্যবহার সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হচ্ছে কৃষিতে। চাহিদার তাগিদে কৃষি জমি দ্রুত অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। এছাড়া বনভূমি, জলাভূমি, পাহাড় কেটে বিভিন্ন প্রকার স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে নদীমাতৃক এদেশের প্রাণ নদী ব্যবস্থা। অনেক নদীই এখন অবৈধ দখল করে কতিপয় সুবিধাভোগী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে।

অন্যদিকে যে সকল অকৃষি জমি রয়েছে সেগুলো ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শহর, নগর, বন্দরে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন, কল-কারখানা স্থাপন, আবাসিক এলাকা নির্মাণ, আবাসিক এলাকায় অনাবাসিক স্থাপনা প্রভৃতি কারণে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষি এবং অকৃষি জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার অব্যাহত থাকলে নদী ব্যবস্থা, জলাভূমি, পাহাড়ী এলাকা, গ্রাম ও শহরের পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাই কৃষি ও অকৃষি ভূমি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ভূমির বহন ক্ষমতা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নের জন্য ভূমি সম্পর্কিত চিন্তা এবং গৃহীত পদক্ষেপকে বুঝায়। অর্থনৈতিক এবং স্থানিক দিক বিবেচনায় ভূমি সংক্রান্ড় নীতি নির্ধারণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। বাসস্থান, খাদ্য, কর্ম, বিনোদন, যাতায়াত ও নিরাপত্তা এই মৌলিক চাহিদা ভূমি ব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং

২. শহুরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা।

১. গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা: বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। ভূমি ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গ্রামীণ এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত।

ক. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনসহ মৌলিক চাহিদার ব্যবস্থা করা।

খ. কৃষি, বনজ, মৎস্য ও পশু সম্পদ উৎপাদনের জন্য জমির বিকাশ সাধন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য সব ধরনের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

গ. ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দেওয়া।

ঘ. খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

ঙ. ভূমি অপব্যবহার বন্ধকল্পে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান তৈরি করা।

চ. জীবন ধারণের উপযোগী পর্যাপ্ত জমি সকলের জন্য নিশ্চিত করা।

ছ. উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।

জ. শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

ঝ. অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

ঞ. শহুরে ও গ্রামীণ এলাকার আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা।

ট. ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং

ঠ. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান বদ্ধি করা।

২. শহুরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা: বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধিষ্ণু। ফলে নগরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে শহর এলাকায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত।

ক. অপরিকল্পিত শহর ও নগরায়ন রোধ করা।

খ. পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন করা।

গ. বর্তমান নগরের মান উন্নয়ন করা।

ঘ. শহুরে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঙ. নাগরিক সুবিধা যেমন- পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ. নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়া।

ছ. শহরের অব্যবহৃত জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

জ. শহরের চাহিদা অনুসারে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

ঝ. পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা।

ঞ. উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা।

ট. শহরের ভূমির যথাযথ বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা।

ঠ. শহরের নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পবলয় গড়ে তোলা।

ড. শহরতলীতে শহরের নিত্য পণ্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ এবং শহুরে ভূমির পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমির দীর্ঘমেয়াদী বহন ক্ষমতা নিশ্চিত করতে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ঢেলে সাজাতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি স্বল্প আয়তনের দেশ। কিছু পাহাড়ী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দেশ প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। তাই উর্বর এদেশের ভূমিতে বহুবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এদেশের ভূমি ব্যবস্থা প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার এবং শহুরে ভূমি ব্যবহার। তবে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে নগরায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে। তাই জনবহুল এদেশের গ্রামীণ এবং শহুরে ভূমি ব্যবহার এর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন:৫.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. ভূমি ব্যবহার বলতে কি বুঝায়?
২. বাংলাদেশের ভূমির ধরন উল্লেখ করুন।
৩. বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভূমি ব্যবহার বলতে বুঝায়? বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার এবং এর পরিবর্তনশীলতা সর্ম্পকে আলোচনা করুন।
২. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কি? বাংলাদেশের গ্রামীণ এবং শহুরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩ : জলবায়ুর উপাদান ও প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- জলবায়ু ও এর উপাদান সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জলবায়ু ও এর উপাদান

যেকোন স্থানের বায়ুমন্ডলের স্বল্পকালীন (প্রতি দিনের বা প্রতি ঘন্টার) অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয়। অপরদিকে কোন স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের(কমপক্ষে ৩০-৪০ বছরের) গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। তাই আবহাওয়ার ন্যায় জলবায়ুর ও প্রধান উপাদান হচ্ছে বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, রৌদ্রময়তা, তুষার, ঝড়, ইত্যাদি। এ সকল উপাদান জীব ও উদ্ভিদের সকল কার্যকলাপের উপর প্রভাবক/নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে আসছে। মোটকথা পৃথিবীর সকল প্রকার জীব ও উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নিম্নে বাংলাদেশের জলবায়ুর বিবরণ দেয়া হলো:

ক) তাপমাত্রা: স্থান ও সময়ভেদে বাংলাদেশের সর্বত্র তাপমাত্রা বা উষ্ণতার ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর নভেম্বর মাস হতে ফেব্রুয়ারি বা অনেক সময় মার্চের শেষ পর্যন্ত সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করায় সূর্য রশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয় ফলে তাপমাত্রা কমে যায়। ফলে শীতের আধিক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই সময় কালকে শীতকাল বলা হয়। এই সময় গড়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° ও ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ সময় গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালে দেশের উপকূলভাগ থেকে উত্তরদিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। এ সময় চট্টগ্রামে ২০° সেলসিয়াস, ঢাকায় ১৮.৩° সেলসিয়াস, দিনাজপুরে ১৬.৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কমে ৮° সেলসিয়াস বা তারও নিচে ৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে আসে। এ সময় রাজশাহীতে ৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, ঈশ্বরদীতে ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় (আবহাওয়া অধিদপ্তর, ১৯৯৯)।

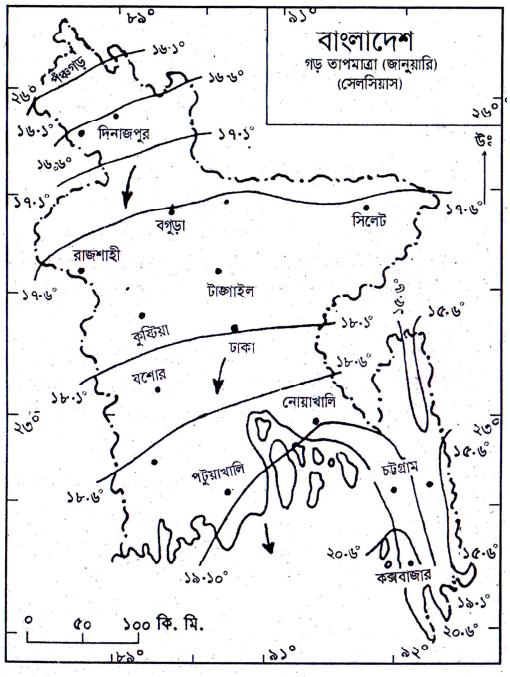

চিত্রঃ সমোষ্ণরেখা (জানুয়ারি)

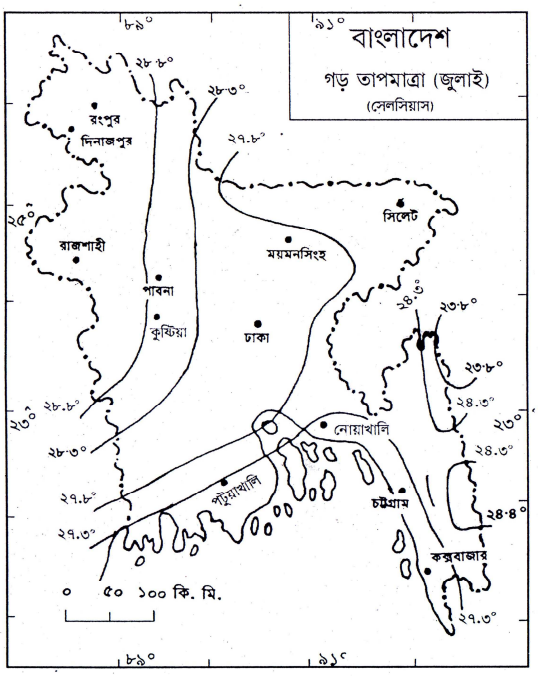

চিত্রঃ সমোষ্ণরেখা (জুলাই)

উৎস: মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, ২০১৩।

মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সূর্যের উত্তর গোলার্ধে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের সূর্য রশ্মি খাড়াভাবে পতিত হয়। ফলে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়কালকে গ্রীষ্মকাল বলা হয়। এই সময়ে গড় তাপমাত্রা ৩০.৪° সেলসিয়াস থেকে ৩৬° সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এ সময় কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে ৩০.৪° সেলসিয়াস, লালপুর (ঈশ্বরদী) ৪৩° সেলসিয়াস, রাজশাহী ৪৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। গ্রীষ্মকালেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিদ্যমান। ফলে আবহাওয়ার মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করে এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয়। যা গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শীত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল ধরা হয় যা জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা বছরের মোট ৮০% বৃষ্টিপাত এ সময় হয়ে থাকে। আবার দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে একে মৌসুমী বৃষ্টিপাতও বলা হয়। বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ৩১°সেলসিয়াস কিন্তু সারা মাসই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রা তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে জলীয়বাষ্প প্রায় থাকেনা বললেই চলে। তবে হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে আসার সময় তুষার কণা হতে সামান্য জলীয়বাষ্প বহন করে যা দেশের পূর্বাঞ্চলে পর্বতসমূহে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। মূলত শীতকালীন বৃষ্টিপাত উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলেই হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থানভেদে ৫.১৫ সেন্টিমিটার। তাছাড়া পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আগত নিম্নচাপের প্রভাবেও কোনো কোনো বছর কয়েক দিনব্যাপী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং এর কারণে সিলেট, মৌলভীবাজার, রাঙামাটি জেলার পূর্বাংশ, বান্দরবান জেলার উত্তর পূর্বাংশ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ১২-১৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

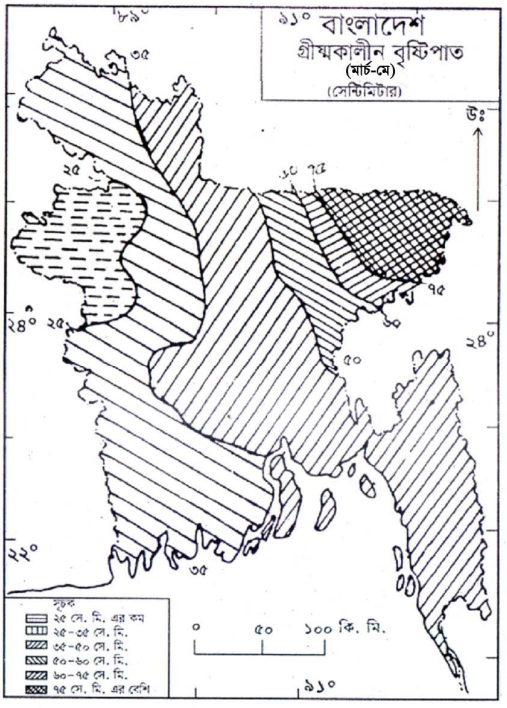

চিত্রঃ গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত

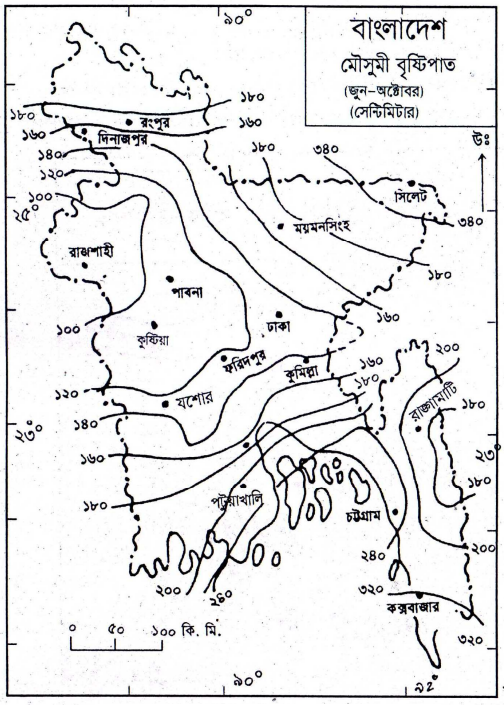

চিত্রঃ মৌসুমী বৃষ্টিপাত

উৎস: মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, ২০১৩।

গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সেন্টিমিটার এবং সিলেট জেলাতে এসময় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয় যার পরিমাণ ৭৫ সেন্টিমিটার বা অধিক এবং রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে কম (প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার) বৃষ্টিপাত হয়। দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের এক পঞ্চমাংশ বৃষ্টি এ সময়ে সংঘটিত হয়।

বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে বাংলাদেশের উপ্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। আবার অধিক তাপমাত্রার ফলে দেশের সর্বত্র যে পানি থাকে তা অধিক তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়ে প্রচুর জলীয়বাষ্প মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে প্রায় প্রতিদিনই পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া

বিদ্যমান জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণে বাংলাদেশের পাহাড়ী জেলাসমূহে (সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি ও বান্দরবান) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ সময়ে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সেমি. এবং সর্বোচ্চ ৩৪০ সেমি.। বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে।

বায়ুপ্রবাহ : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে এবং উত্তর দিক থেকে পূর্বাঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ড় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধেক অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিমা এবং পূর্বাংশের অর্ধেক অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হয়। কখনও কখনও কালবৈশাখী ঝড়ের প্রভাবে বায়ু প্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ড় সকল বায়ু দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়। অক্টোবরে বায়ু প্রবাহ পরিবর্তনশীল হয়। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ও আর্দ্র দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে এ সময় পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যা কালবৈশাখী নামে অভিহিত। আবার জুন মাসে সূর্য বাংলাদেশের উপর অবস্থান করায় বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে ফলে উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ অর্ন্তনিহিত হয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

বায়ুমন্ডলের চাপ ঃ শীতকালীন সময়ে (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি) উচ্চচাপ বিরাজ করে যেমন জানুয়ারি মাসের গড় চাপ ১০২০ মিলিবার যা নির্দিষ্ট এক উচ্চচাপ অঞ্চল সৃষ্টি করে। পরবর্তী কিছু মাসে লক্ষণীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ড় নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি করে, গড়ে ১০০৫ মিলিবার। বাতাসের বিপরীতমূখী প্রবাহের কারণে মে জুন মাসে চাপের পরিবর্তন ঘটে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে থাকে।

বাতাসের আর্দ্রতা : বাংলাদেশে গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বছরে গড়ে ৭৮.১০%। এ জন্য শীতকালে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলায় কুয়াশা, শিশির ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। সাধারণত জানুয়ারি- মার্চ মাসে সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৫৭% ধরা হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতিঃ উপরের আলোচনা হতে বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান তিনটি প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। যথা শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। সাধারণত বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। কর্কটক্রান্ড়ি রেখা এ দেশের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় ক্রান্ড়ীয় জলবায়ু বিরাজ করে। আবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্ড়ীয় মৌসুমী জলবায়ুও বলা হয়। ক্রান্ড়ীয় জলবায়ুর প্রধান প্রকৃতি হলো বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু(গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত) আবির্ভাব। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো তাপমাত্রা কখনই চরমভাবাপন্ন হয় না। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। তবে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত রাজশাহী অঞ্চলের লালপুরে (১১৭.৫ সেন্টিমিটার) এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলের লালখানে (৬৩৭.৫ সেন্টিমিটার) পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর অন্যান্য সাধারণ প্রকৃতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

১। বাংলাদেশের জলবায়ুতে উষ্ণ আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল পরিলক্ষিত হয়।
২। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা হতে দেখা যায়।
৩। বাংলাদেশের জলবায়ুতে বিভিন্ন ঋতুতে উচ্চ তাপমাত্রা, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা ইত্যাদি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৪। ষড় ঋতুর দেশ বলে পরিচিত হলেও মূলতঃ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুর প্রাধান্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়।
৫। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র হলেও স্বল্প বৃষ্টিপাত ও ঝড় সংঘটিত হয়।
৬। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠ সংক্ষেপ

কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। জলবায়ুর প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মেঘাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। জলবায়ুর উপাদানগুলোর তারতম্যের ভিত্তিতে জলবায়ুর প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এই পাঠে জলবায়ুর উপাদান ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন:৫.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. জলবায়ু কাকে বলে? এর বিভিন্ন উপাদানসমূহ কি কি?
২. বাংলাদেশের তাপমাত্রার বৈচিত্র্যতা বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের কারণ বর্ণনা করুন।
৪. বায়ু প্রবাহ বাংলাদেশের জলবায়ুকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে? আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জলবায়ু ও তার উপাদানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : জলবায়ুর পরিবর্তন ও আত্মস্থকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আত্মস্থকরণ কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন

সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশের প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমন্ডলের ওজোন স্ড়রের ক্ষতি সাধন। ঝুঁকিপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান এবং উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনেক বেশি। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো। যথা:

তাপমাত্রা বৃদ্ধি: আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ০.০০৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অনুভূত হত। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠেছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা সমুদৃপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়ছে। অপরদিকে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী, এক মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ১৫ শতাংশ ভূ খন্ড তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লবনাক্ততা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবনাক্ততার কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশের কৃষিবৈচিত্র্য বদলে যাচ্ছে। বিগত তিন দশকে খুলনা জেলায় লবনাক্ততা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি, ২১ শতাংশ। বাগেরহাটে বেড়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। নড়াইল, যশোর ও গোপালগঞ্জে লবনাক্ততা একেবারেই ছিলনা। অথচ সেখানকার জমিতেও লবনাক্ততা বেড়েই চলেছে। উপকূল এবং তীরবর্তী এলাকায় ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় লবনাক্ত মাটি রয়েছে। এ অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে লবনাক্ততা আরো ভিতরের দিকে আসবে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। লবনাক্ততা বর্ষা মৌসুমে ১০ শতাংশ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে তা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয় (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০১৩)।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি: ধারণা করা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলশ্র"তিতে উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙ্গনও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র ভাঙ্গনের কবলে পড়ে কুতুবদিয়া ও সন্দ্বীপের বিস্ড়ীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। তাই বন্যার প্রবণতা এমনিতেই বাংলাদেশে বেশি আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত বেড়ে গেলে বন্যার প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে প্রভাব: ভয়াবহ সিডরের কারণে সুন্দরবনের পশুপাখি এবং গাছপালার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে কেটে যাবে বহু বছর। নানামুখী কারণে প্রকৃতিগতভাবে যে খাদ্যচক্র তৈরি ছিল তার একটির ব্যাঘাত ঘটলেই চাপ পড়বে অন্যটির উপর। কারণ বিষয়গুলো একটি আরেকটি সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন এন্ড নেচার এর সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিলুপ্তির পথে রয়েছে ৮০০ ধরনের উভচর প্রাণী, ৬৩ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৭ প্রজাতির পাখি, ৪৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ ২৫৭ প্রজাতির প্রাণী এবং বিলুপ্ত হয়েছে নেকড়ে, বনমহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, তিন প্রজাতির গন্ডার, ৪৩ প্রজাতির মাছ এবং ২১ প্রজাতির কীটপতঙ্গ।

নদ-নদীর উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের ১৪৩টি ছোট বড় স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে ৮০টি মরে গিয়ে খালে পরিণত হয়েছে। ৬৩টি নদীর অস্ড়িত্ব খুঁজেই পাওয়া যায়না। অযত্ন, অবহেলা, অবৈধ দখল ও পরিবেশ বিরোধী দুবৃত্তায়নের কারণে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, গড়াই, কর্ণফুলী, সুরমাসহ দেশের বড় বড় নদীতে জেগে উঠেছে বিশাল বিশাল চর। বছরে দেশের ৪ লাখ মানুষ নদীভাঙ্গনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৭টি জেলার প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ ভয়াবহ আর্সেনিকের শিকার (খান, আহম্মদ নুমান, ইসলাম, রবিউল ২০০৯)।

বৃষ্টিপাতের উপর প্রভাবঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, দেরীতে বর্ষাকাল, স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ভারী বর্ষণ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- বিগত ২০০৯ সালের ২৮ জুলাই ঢাকায় রাতে ঘন্টায় ৩৩৩ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় যা বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত। তাছাড়া ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে একই দিনে অবিরাম বৃষ্টি হয় এবং ৬ ঘন্টায় ৩০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়, যার ফলে চট্টগ্রামে ভূমিধ্বস, বন্যা ও পাহাড় ধ্বসের মত ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০১১ সালের ১৮ই জুলাই ভারী বর্ষণে সারা দেশে ৯ জন লোক মারা যায় (সারণি-১)।

সারণি-১: ভারী বর্ষনে ২০১১ সালের ১৮ই জুলাই বিভিন্ন জেলায় মৃতের সংখ্যা

জেলা	মৃতের সংখ্যা
সিলেট	০৩
গাইবান্ধা	০৩
জামালপুর	০১
বগুড়া	০১
সিরাজগঞ্জ	০১
মোট	০৯

উৎস: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০১৩।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসঃ বঙ্গোপসাগরে পূর্বের তুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এর তীব্রতা ও মাত্রাও বেড়ে গেছে। প্রতি ৩ বছরে একটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। বিগত ১২৫ বছরে ৪২টি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে ১৪টি প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে সাম্প্রতিক ২৫ বছরে। এর কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। গত ২৫ মে ২০০৯ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ উপকূলীয় জেলার ওপর দিয়ে ঘন্টায় ৯২ কিলোমিটার বেগে বয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় আইলা, যাতে হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং ৫০ হাজারের অধিক লোক গৃহহারা হয়। বিগত ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ভয়ানক এবং প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় "সিডর" ঘন্টায় ২২৩ কিলোমিটার বেগে বাংলাদেশে আঘাত হানে এবং এতে ৩,৩৬৩ এর অধিক লোকের প্রাণহানী ও অগনিত নিখোঁজ এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়। (আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০১৩)।

বন্যাঃ বাংলাদেশে জুলাই-আগষ্ট মাসে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা যাতে সাধারণত ২০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। কোনো কোনো বছর এই হার ৬৮ শতাংশ বা তার অধিক হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে (১৯৮৮, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭, ২০১২ সালে)।

খরাঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণত দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে কম। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো কমে গেছে এবং ঐসব এলাকার খরা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ড় এই দেশে ১৯ বার খরা লক্ষ্য করা গেছে, যা দেশের মোট আয়তনের ৪৭% এলাকায় প্রভাব ফেলছে (WARPO, ২০০৫)।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেলের (২০০৭) প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত মারাত্মক হুমকির স্বীকার হবে। প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই শতকে আরও বৃদ্ধি পাবে।
- ২০৫০ সালের মধ্যে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের ১৭% ভূ-ভাগ তলিয়ে যাবে ফলতঃ ৪ কোটি লোক বাস্তুভিটা হারাবে, পেশা ও জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চিত জীবন-যাপনে বাধ্য হবে। বেড়ে যাবে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাস।
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সুনামি, সিডর, নার্গিস, আইলাসহ, ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, পাহাড় ধ্বস ইত্যাদি ঘন ঘন অথবা বেশি মাত্রায় হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে। এই শতকে তা বেড়ে ৩০০-৪৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে।
- দেশের নদ-নদীর প্রবাহ কমে যাবে। বিগত ২০০ বছরে প্রায় ২৫০০ নদ-নদীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে যে ৭০০ নদীর অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে মাত্র ২০০টির মত নাব্যতা কোনোমতে ধরে রেখেছে। অর্ধজীবিত-নাব্য মিলিয়ে মাত্র ২০০ নদ-নদীর মধ্যে আগামী ৫০ বছরে অধিকাংশ মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করতে হবে মেঘনা-যমুনার মত নদীকেও।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন আত্মস্থকরণ কৌশল

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকা অতি নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশ আবাদি জমি নষ্ট হবে প্রায় ১৪ শতাংশ, ২৮-৩০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস হতে পারে, জলমগ্ন হতে পারে আরও প্রায় ১৫.৮ শতাংশ জমি। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৫, বরিশালের ৯৯, পটুয়াখালীর ১০০, নোয়াখালীর ৪৪ এবং ফরিদপুরের ১২ শতাংশ এলাকা ডুবে যেতে পারে। ফলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষকে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে উঁচু অঞ্চলে অভিগমণ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আত্মস্থকরণের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অনুসরন করা যেতে পারে। যেমন-

১। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় আত্মস্থকরণ কৌশল।
২। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বিপন্ন খাতের সাথে আত্মস্থকরণের সুযোগ ও কৌশল।
৩। আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে আত্মস্থকরণের কৌশল।
৪। স্থানীয় পর্যায়ে আত্মস্থকরণের কৌশল।

১। জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মোকাবেলায় আত্মস্থকরণের কৌশলঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাইক্লোন, ঝড়-জলোচ্ছাস, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও লবনাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বেড়ে যাবে। এ সকল সঙ্কট মোকাবেলায় নিম্নোক্ত আত্মস্থকরণের কৌশলসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.১। সাইক্লোন, ঝড়-জলোচ্ছাস, টর্নেডোর মাত্রা রোধকল্পে -

- গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পরিবর্তে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বনায়ন করতে হবে। যেমনঃ উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা যেতে পারে। জোয়ারের ঠিক বাইরের এলাকায় বিভিন্ন স্তরের (উচ্চতার) বন সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- বাতাসের বেগ কমাতে স্বল্প দূরত্বে গাছ লাগানো যেতে পারে। এবং
- বাঁশ জাতীয় বন সৃষ্টি করতে হবে।

১.২। জলাবদ্ধতা ও বন্যা রোধে-

- উঁচু স্থানে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।
- ভাসমান কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটাতে হবে।

১.৩। মাটি ও পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি রোধকল্পে-

- মাটির গুণাগুন পরীক্ষা করে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে লবন সহিষ্ণু ফসলের জাত নির্বাচন করতে হবে।
- লবনাক্ততা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১.৪। গৃহ ও কৃষি কাজে মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে-

- পুকুর, ডোবা, খাল ও নদী খনন / পুনর্খনন করতে হবে।

- গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১.৫। নদীর উপকূল ক্ষয় হ্রাস করতে-

- ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলগ্রহণ এলাকা (Water Shade) ব্যবস্থাপনা, নদী তীরে পাম জাতীয় গাছ ও কাশ ভার্টিভার জাতীয় তৃণ রোপণ করা যেতে পারে।

১.৬। মাছের আবাস পরিবর্তন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায়-

- নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ডিমপাড়া মৌসুমে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১.৭। খরা রোধে-

- বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি জোরদারের মাধ্যমে প্রচুর বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট বিপন্ন খাতের আত্মস্থকরণের সুযোগ ও কৌশলঃ** জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত সঙ্কট সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষি, জীববৈচিত্র্য, পানি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য ও অবকাঠামো প্রভৃতি খাতকেও বিপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে আত্মস্থকরণের যে সকল সুযোগ ও কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ

	বিপন্নখাত	আত্মস্থকরণের সুযোগ ও কৌশল
২.১।	কৃষি	• প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন • ফসলের তাপ ও ঠান্ডা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন • খরা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ • টেকসই উৎপাদন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
২.২।	জীববৈচিত্র্য	• প্রতিবেশভিত্তিক (Eco-system based) সংরক্ষণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ • সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ সংরক্ষণ এবং ব্যবহার ভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্তকরণ • সংকটাপন্ন প্রজাতি চিহ্নিত করে তাদের সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ • গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার।
২.৩।	পানি	• লবনাক্ত ও আর্সেনিক দূষণ এলাকার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ • শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ • শিল্পবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক চালু রাখার জন্য সরকারিভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।
২.৪।	জনস্বাস্থ্য	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির মাত্রানুযায়ী ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ • বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে • পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
২.৫।	খাদ্য নিরাপত্তা	• প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য গুদাম ও কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরি করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে • ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে।
২.৬।	অবকাঠামো	• ঘুর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম আবাসন গড়ে তুলতে হবে • মাছ ধরার নৌকার কাঠামো আধুনিকায়ন করতে হবে • স্থায়ী বাঁধ নির্মানের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। **আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে আত্মস্থকরণ:** বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে স্থানীয় প্রকৃতিকে গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিত নীতিমালায় সেই সব উপকূলীয়

জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এক্ষেত্রে নীতিমালায় যে বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া দরকার-

৩.১ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ জোর দিতে হবে।

৩.২ সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার অধিকারকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

৩.৩ উপকূলীয় সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

৩.৪ উপকূলীয় সম্পদ সম্পর্কিত মানব সম্পদ উন্নয়ন যার জন্য উপকূল বিষয়ে বিশেষায়িত ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রয়োজন।

৩.৫ সমষ্টিগত নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

৪। **স্থানীয় পর্যায়ে আত্মস্থকরণের কৌশলসমূহ:** স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিবেশ বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ উপকূলীয় জনপদে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমাতে নিম্নোক্ত অভিযোজন কৌশল সুপারিশ করেছেন-

৪.১ উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ;

৪.২ হাঁস পালন;

৪.৩ চাষের জন্য লবনাক্ততা সহনীয় ফসল নির্বাচন;

৪.৪ ভাসমান বাগান করতে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ:

৪.৫ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৬ লবনাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭ মাছ ধরতে যাবার সময় জেলেদের নৌকায় রেডিও রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমন্ডলের ওজোন স্ড়রের ক্ষতি সাধনের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা, লবনাক্ততা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন আত্মস্থকরণ কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে প্রধান চারটি পর্যায়ে। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপন্ন খাতসমূহকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন:৫.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কি কি আত্মস্থকরণের কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে?

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন খাত সমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল আলোচনা করুন।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশলসমূহ কি কি? ডবস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-৫: নদ-নদী ও জীবন প্রবাহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- জীবন-যাত্রায় নদীর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। শত শত নদী মানবদেহের শিরা-উপশিরার মত এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। প্রায় ৭০০ টি নদী-উপনদী নিয়ে এখানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। একটি বৃহৎ নদী ও এর উপনদী সমূহ মিলে একটি নদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের নদী-নালাগুলো দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। দেশের উত্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং আকার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের নদীমালার মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ বিশ্বের ২২তম (২,৮৫০ কি.মি.) এবং গঙ্গা নদী ৩০তম (২,৫১০ কি.মি.) স্থানের অধিকারী। নদী নামকরণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। একই নদীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। এমনকি কোন একটি নদীর মাত্র পাঁচ/ছয় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অংশকেও এর উজানের নামের থেকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। নতুন নামকরণ কোন স্থান থেকে শুরু হলো তা নির্ধারণ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। আবার একই নামে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নদীর অস্তিত্ব রয়েছে।

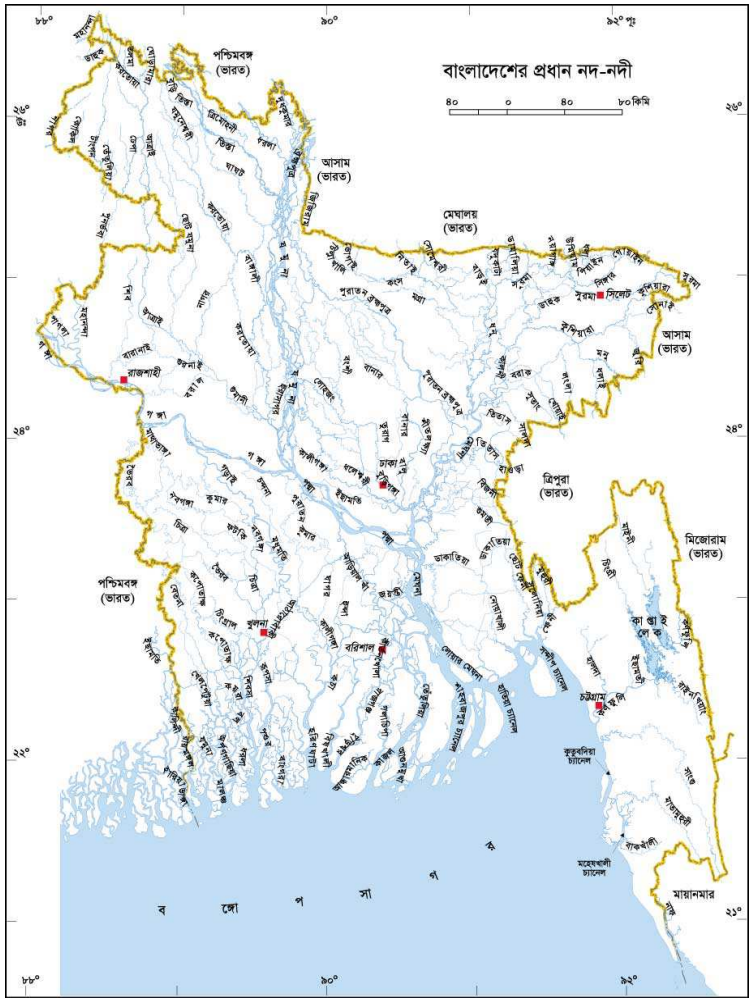

নদী ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের নদীমালাকে চারটি প্রধান নদী ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়:

১) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা;
২) গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা;
৩) সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা এবং
৪) চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীসমূহ।

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা: বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী ব্যবস্থার অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ তাদের প্রধান উপনদী তিস্তা ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখানদী-উপনদী সহযোগে দেশের বৃহত্তম এই নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই নদী প্রণালী অববাহিকায় দেশের বৃহত্তম প্লাবনভূমি (floodplain) অবস্থিত। এই নদীপ্রণালীর নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৫,৭৩,৫০০ বর্গ কি.মি। নদী ব্যবস্থার দুটি ডানতীর উপনদী এবং দুটি বামতীর শাখানদী রয়েছে। তিস্ড়া এবং আত্রাই-গুর ব্রহ্মপুত্র নদের পরিত্যক্ত মূলধারা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরী এই নদী ব্যবস্থার বামতীরস্থ দুটি শাখানদী।

২. গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা: এটি বৃহত্তর গঙ্গা নদী প্রণালীর একটি অংশ। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। নির্গত ভাগীরথী এবং মধ্য হিমালয়ের নন্দীদেবী শৃঙ্গের উত্তরে অবস্থিত গুরওয়াল থেকে উৎপন্ন অলোকনন্দা নদীর মিলিত ধারা ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পৌঁছেছে। গঙ্গা কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার মাঝখান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পদ্মার মোট দৈর্ঘ্য ৩২৪ কি.মি.।

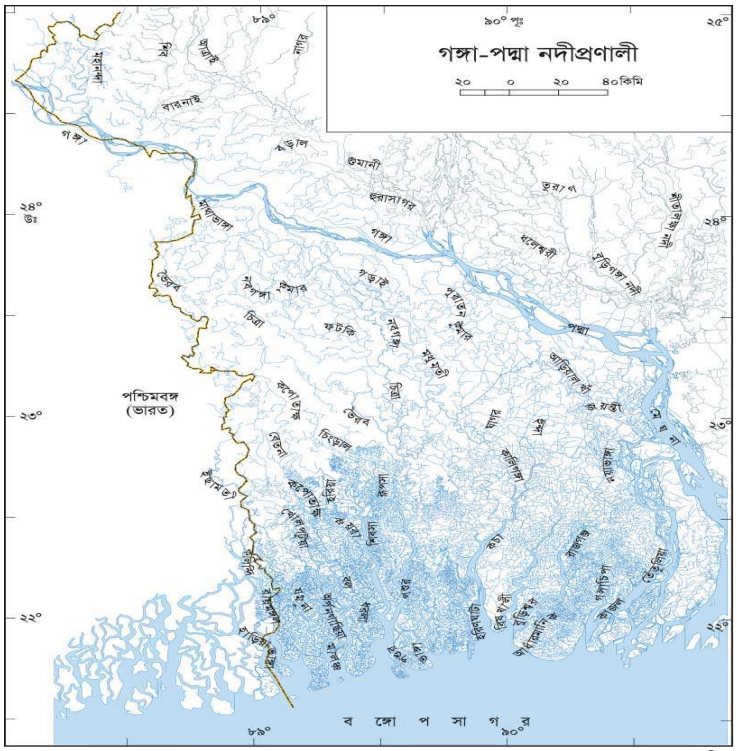

গঙ্গার উত্তরের প্রধান উপনদী মহানন্দা। অপরদিকে নাগর, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা মহানন্দার উপনদী।

বড়াল গঙ্গার বামতীরের শাখানদী। গঙ্গার আরেকটি শাখানদী ইছামতি। এটি পাবনা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে বের হয়ে পাবনা শহরকে দু'ভাগ করে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। গঙ্গা থেকে উৎপন্ন ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, কুমার, মধুমতি, আড়িয়ালখাঁ, বলেশ্বরের ধারাসমূহ এবং এদের অসংখ্য শাখানদী সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩. সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা: এই নদীপ্রণালীতে অবস্থিত মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৯ কিলোমিটার। মেঘনা নদীর উৎপত্তি ভারতের শিলং ও মেঘালয় পাহাড়ে। ভারতে এর নামক বরাক নদী। সিলেট জেলার অমলশিদ নামক স্থানে

বাংলাদেশ সীমান্তে বরাক নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নাম ধারণ করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উলে-খযোগ্য উপনদী হচ্ছে- লুবা, কুলিয়া, শারিগোয়াইন, চালতি নদী, চেনগড় খাল, পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী ও কংস। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচরে সুরমা মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে আগত একাধিক নদীকে কুশিয়ারা উপনদী হিসেবে গ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মনু নদী। সুরমার উপনদীগুলির তুলনায় কুশিয়ারার উপনদী কম খরস্রোতা, তবে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ।

সুরমা কুশিয়ারা মারকুলির কাছে পুনরায় মিলিত হয় এবং মেঘনা নামে ভৈরব হয়ে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎপন্ন গোমতী ও খোয়াই নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালীর নিষ্কাশন এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮০২,০০০ বর্গ কি.মি যার মধ্যে ৩৬,২০০ বর্গ কি.মি বাংলাদেশে অবস্থিত। মেঘনা নদীর গতিপ্রবাহকে সুস্পষ্টভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়– ভৈরববাজার থেকে ষাটনল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রবাহকে আপার মেঘনা এবং ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহপথকে লোয়ার মেঘনা নামে অভিহিত করা হয়।

মেঘনার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখানদী তিতাস। মেঘনার অন্যান্য শাখানদীগুলি হচ্ছে পাগলী, কাটালিয়া, ধনাগোদা, মতলব এবং উদামদি। মেঘনা ও এর শাখানদীগুলি ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার গোমতী, হাওড়া, কাগনী, সিনাই, বুড়ি, হরি, মঙ্গল, কাকরী, পাগলী, কুরলিয়া, বালুজুড়ি, সোনাইছড়ি, হান্দাছোড়া, জাঙ্গালিয়া ও দুরদুরিয়াসহ অসংখ্য স্রোতধারার জলরাশি লাভ করে থাকে।

৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীসমূহ: চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্ণফুলী নদী। এটি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কি.মি.। এ নদী রাঙামাটি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হলো কাসালং, হালদা, চেঙ্গী, মাইনী, রাখিয়াং, শিলক, শ্রীমাই এবং বোয়ালখালী ইত্যাদি। কর্ণফুলী নদীতে রাঙামাটির কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সাঙ্গু নদী মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ে উৎপত্তি লাভ করে বান্দরবান এবং চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলের অন্যান্য নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে মাহামুহুরী, চিংড়ি ইত্যাদি।

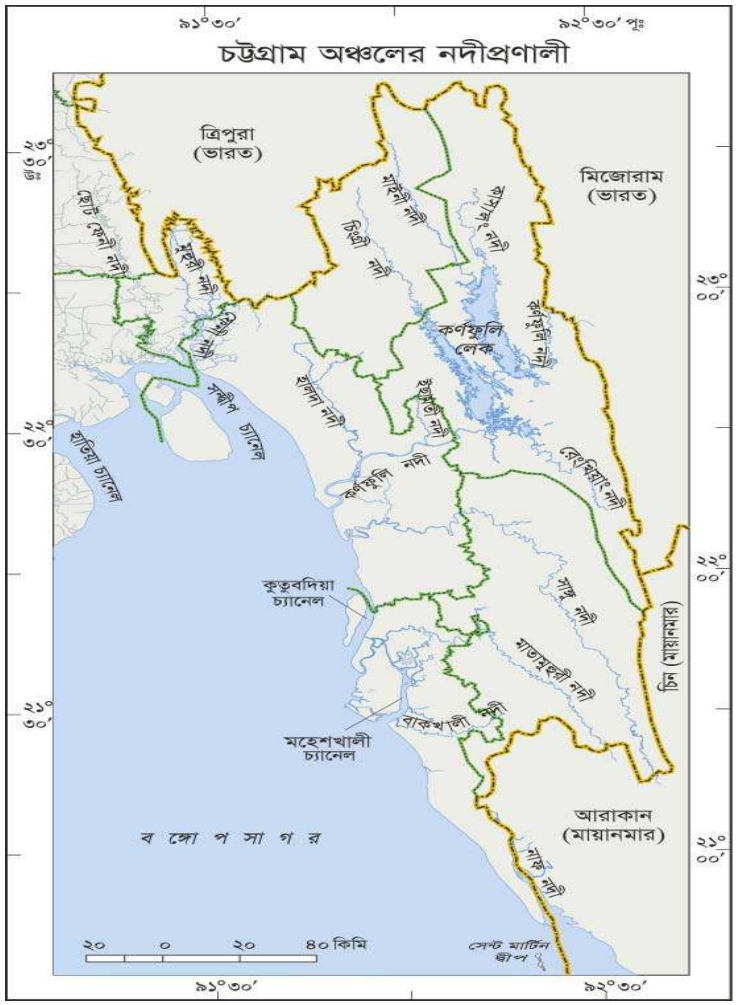

নদী ও জীবন ধারা

বাংলাদেশের মানুষের জীবন ধারায় নদীর ভূমিকা অপরিসীম। কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের মানুষ নদীর উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নতি এবং বসতির ক্রমবিকাশ ও বিস্ড়রণে নদীপ্রণালী গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষিকাজের জন্য উর্বর উপত্যকাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন বসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নদীপথ ব্যবহার হচ্ছে। যে কারণে প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর নদীর তীরে

গড়ে উঠেছে। তবে এই এলাকার নদী খাতের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে এক স্থানে বসতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে সেচের উৎস হিসেবে নদীর পানির ব্যবহার একটি প্রাচীন রীতি। বাংলাদেশের প্লাবন ভূমি মূলত ব-দ্বীপ আকৃতির পলি গঠিত সমভূমি যা পাললিক ও সামুদ্রিক উপাদান থেকে গড়ে উঠেছে। ভূমির নিম্ন উচ্চতা ও বন্ধুরতার কারণে পানি অত্যন্ড় ধীরে গড়ায় এবং নদ-নদীগুলির সর্পিলপথে এঁকেবেঁকে চলার প্রবণতা থাকে। ভাঙ্গাগড়া ও বারবার বন্যা বা বিভিন্ন ধরনের প্লাবন দ্বারা নবগঠিত ভূমি গড়ে উঠেছে এবং অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম খরচের কারণে অধিকাংশ কৃষক সেচের জন্য নদীর পানির উপর নির্ভর করে। স্বাদু পানির মাছের উৎস হল নদী। অসংখ্য নদ-নদী স্বাদু পানির মাছের প্রাকৃতিক আবাস। মোট প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের প্রায় ৬০% আসে মাছ থেকে এবং প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ মৎস্য উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আরও প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের জীবিকা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে পানি সম্পদ বিশেষ গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ব্যাপক পরিসরে সেচকার্যের প্রাথমিক পরিকল্পনাসমূহে বাঁধ দিয়ে পানিকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার মাধ্যমে সেচকার্যে পানি সরবরাহের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। উপকূলীয় বেড়িবাঁধসমূহ নির্মাণের ফলে তীরভূমি এলাকাগুলো জোয়ার দ্বারা কম প্লাবিত হতে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাটার টানে সরে আসা পানির স্রোত জোয়ারের সময় বয়ে নিয়ে যাওয়া পলি যথাযথভাবে অপসারণ ঘটাতেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে নদীখাতগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে আসছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত গড়াই-মধুমতির মতো প্রধান নদীসমূহের সমান্তরালে গড়ে উঠেছে। নদীগুলোতে পর্যাপ্ত প্রবাহ না থাকায় এ এলাকায় নৌপরিবহণ ব্যবস্থা উত্তরোত্তর ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। বর্তমানে নৌপরিবহণ সুবিধা রয়েছে এমন অঞ্চলে নতুন নির্মাণ একদিকে যেমন প্রচুর অর্থের ব্যয় সাধন করবে, তেমনি এতে কৃষিজমিরও বিনাশ ঘটবে। তাই নদীগুলোতে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নদীতে নৌপরিবহণ ব্যবস্থা উন্নতি করা সম্ভব। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে নেপালের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মংলা বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষুদ্রায়তন সেচ উলে- খযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নদীপ্রণালীসমূহ সমগ্র দেশের ভূ-প্রকৃতি, জলসংস্থান, ভূসংস্থান, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ এবং প্রাণীজগতের বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়নে এর অবদান অব্যাহত রাখতে হলে এই নদীপ্রণালীসমূহ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনা প্রয়োজন।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে। দেশের নদীপ্রণালীকে চারটি প্রধান নদী ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হল: ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা, গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা, সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীসমূহ। এসব নদী ব্যবস্থায় অনেক শাখা নদী এবং উপনদী রয়েছে। এই নদীগুলোর সাথে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের আবাসস্থল থেকে শুরু করে যাতায়াত ব্যবস্থা, নগর, বন্দর প্রভৃতি উঠেছে যা মানুষের জীবনযাত্রাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৫.৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কি কি?

২. গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের নদীগুলো কিভাবে জীবন ধারাকে প্রভাবিত করে? বর্ণনা করুন।